নির্বাচিত ছোটগল্প

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥এ-আমল সে-আমল॥

ঠিক কত বয়সে সে তা মনে নেই কিন্তু এবারে একটা চাকর পেলেম আমি। চাকরের আসল নামটা শ্রীরামলাল কুণ্ডু, নিবাস বর্ধমান বীরভুঁই। সে কিন্তু বলত তার নাম—ছী আম্‌নাল কুণ্ডু।

ছেলেবেলা থেকে রামলাল ছিল আমাদের ছোটোকর্তার কাছে। ঘুমের আগে খানিক পায়ে সুড়সুড়ি না দিলে ছোটোকর্তার ঘুমই আসত না। সেই মস্ত ভার পেয়েছিল রামলাল। কিন্তু কাজে টিকতে পারল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা একেবারে সুনিয়মে বাঁধাচালে চলত ছোটোকর্তার কাজকর্ম সমস্তই। নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হলে ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা—এমনি নানা উৎপাত আরম্ভ হত। চাকরদের এই-সব বুঝে চলতে হত, না হলেই তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত। এই-সব নিয়মের গোটা কতক বলি, তা হলে হয়তো বোঝা যাবে কেন, রামলাল ছোটোকর্তার পদসেবা ছেড়ে ছোটোবাবু—আমার কাছে—পালিয়ে এল।

শুনেছি সেকালের বড়ো বড়ো পাথরের গোল টেবিলের বাঁকা পায়াগুলো সইতে পারতেন না ছোটোকর্তা। এক চাকরকে প্রত্যহ তোয়ালিয়া দিয়ে টেবিলের পায়া তিনটিকে ঘোমটা পরিয়ে রাখতে হয়, এবং সর্বদা নজর রাখতে হত তোয়ালিয়া বাতাসে সরে পড়ল কিনা। হুঁকোবরদার, তার কাজই ছিল যে প্রথম টানেই সটকা থেকে ধোঁয়া পান যেন কর্তা—একবারের বেশী দু'বার না টান দিতে হয়। দেওয়ালে বাঁকা ছবি থাকলে মুশকিল। ছেলেবেলা থেকে ছোটোকর্তার পা না টিপলে ঘুমই আসত না, সেজন্যে ছিল বিশেষ চাকর, যার হাত পরীক্ষা করে ভর্তি করা হত কাজে—কড়া হাত না হয়। ঘুমের আগে গল্পশোনা, সকালে খবর শোনানো—এমনি নানা কাজে নানা লোক ছিল। সব চেয়ে শক্ত কাজ তার—যাকে বারোমাসই ছোটোকর্তার আছমনের জল দিতে হত। কর্তার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই এক আঁজলা জল চাকরের গায়ে ছিটোতে হবে। তোপ পড়ার সঙ্গে ছোটোকর্তা একবার হাঁচবেনই, যেদিন হাঁচি এল না সেদিন ডাক্তারের ডাক পড়ল।

BANGLADARSHAN.COM

ছোটোকর্তার এই সব অকাট্য নিয়মের কোন্‌টা ভঙ্গ করে যে রামলাল বরখাস্ত হয়েছিল তা সেও বলে নি, আমিও জানি নে। রামলাল যখন এল আমার কাছে তখন সে ছোকরা আর আমি কত বড়ো মনেই পড়ে না, শুধু এইটুকু মনে আছে—আমি ধরা আছি তখনো আমাদের তিনতলার মাঝের হল্‌টাতে। আশপাশের ঘরগুলো থেকে পাঁচ-সাতটা ধাপ উঁচুতে এই হল্‌টা। মস্ত ছাত, বারোটা পল্‌তোলা মোটা মোটা থামের উপর ধরা, থামের মাঝে মাঝে লোহার রেলিঙ। কড়ি, বরগা থাম জানলা দরজার বাহুল্য নিয়ে মস্ত ঘরটা যেন একটা অরণ্য বলে মনে হত। সেকালের বড়ো বড়ো ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবার হুক আর কড়া—সেগুলোকে দেখে মনে হত যেন সব টিকটিকি আর বাদুড় ঝুলে আছে মাথার উপরে—দিনের পর দিন একভাবেই আছে তারা!

এই অনেক দ্বার, অনেক থাম, অনেক কড়ি-বরগা, প্রাচীর আর লোহার রেলিঙ ঘেরা স্থানটা, এর মধ্যে মস্ত খাঁচায় ধরা ছোট্ট জীব—খাই খাই আর ঘুমোই। এই খাঁচার বাইরে কী ঘটে চলেছে, কী বা আছে, কিছুই জানার

উপায় নেই। এক-একবার চারদিকের জানলা ক'টা খুলে যায়—আলো আসে, বাতাস আসে, আবার ঝুপঝাপ বন্ধ হয় জানলা—এই করেই জানি সকাল হল, দুপুর এল, বিকেল হল, রাত হল।

সম্পূর্ণ ছাড়া পাই নি তখনো আকাশের তলায়, চলতে ফিরতেও পারি নে ইচ্ছামতো। বাড়ির অন্য অংশগুলো থেকেও আলাদা করে ধরা আছি। দাসী দু-একটা কখনো কখনো বসে এসে ঘরটায়, তাদের দেশের কথা বলাবলি করে, মনিবদের গালাগালি দেয় চুপিচুপি। একটা কালো বেড়াল, রোজই সন্ধ্যায় দেখা দেয়—কী খুঁজতে সে আসে কে জানে—এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। খাট-পালঙগুলো নড়ে না চড়ে না—দিনের বেলায় বালিশ তার তোশকের পাহাড় সাজিয়ে বসে থাকে, আর সন্ধ্যা হলে মশার ভনভনানির মধ্যে ধুনোর ধোঁয়াতে মশারির ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কেমন এক ফাঁকা ফাঁকা ভাব জাগায় আমার মনে এই ঘরটা। বৈচিত্র্য নেই বললেই হয় ঘরটার মধ্যে। করবারও কিছু নেই এখানটায়।

এই অবিচিত্র ফাঁকার মধ্যে রামলাল যখন আমাকে তার বাবু বলে স্বীকার করে নিলে তখন ভারি একটা আশ্বাস পেলেম। মনে আহ্লাদও হল—এতদিনে নিজস্ব কিছু পেলেম আমি। রামলাল আসার পর থেকেই বাড়ির আদব কায়দাতে দোরস্ত হয়ে ওঠার পালা শুরু হল আমার। একজন যে ছোটোকর্তা আছেন, তাঁর যে একটা মস্ত বাড়ি আছে অনেক মহলা, সেখানে যে পূজোয় যাত্রা বসে মথুর কুণ্ডুর—এ-সব জানলেম। অমনি না-দেখা বাড়ি না-দেখা মানুষদের দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হয়ে গেল বাইরেটাতে আর আমাতে। এই সময়টাতেই আরব্য-উপন্যাসের এক টুকরোর মতো এই তিনতলার ঘরটার আগের কথা এবং আগের ছবিটাও পেয়ে গেলেম কার কাছ থেকে তা মনে নেই। এই বাড়িটাকে সবাই ডাকে তখন 'বকুলতলার বাড়ি' বলে। শুনেছি বাড়ি ছিল আগে একতলা বৈঠকখানা। এর দক্ষিণের বাগানে ছিল মস্ত একটা বকুলগাছ—পাঁচপুরুষ আগে সেই গাছের নামে বাড়িখানা 'বকুলতলার বাড়ি' বলে চলছে—আমি যখন এসেছি তখনো! এমনি ছেলেবেলায় চোখে দেখছি যে-মস্ত-হল্‌টাকে একেবারেই ফাঁক, শোনাকথার মধ্যে দিয়ে কল্পনাতে সেই বাল্যকালেই দেখতে পাই হলঘরটাকে সুসজ্জিত, যখন লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন কর্তার কাছে দিনরাত তখনকার আমলে।

BANGLADARSHAN.COM

সেই কালের এই হল্—হল্ বললে ঠিক ভাবটা বোঝায় না—চণ্ডীমণ্ডপ তো নয়ই—বারো দোয়ারী কতকটা আভাস দেয়—কিন্তু ঠিক বুঝি যদি ভেবে নিই, একটা মস্ত জাহাজের ডেক, তিনতলার উপরে, জল্ থেকে তুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রমাণের অতিরিক্ত মোটা মোটা লম্বা কড়ি থাম জানলা দরজা এবং আলো হাওয়া আসবার জন্যে আবশ্যকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ফাঁক দিয়ে প্রস্তুত আমাদের এই তিন তলার মাঝের ঘরটা। বাইরেটাকে একটুও না ঠেকিয়ে অথচ বাইরের উৎপাত রোদ, বৃষ্টি, লোকের দৃষ্টি ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ আগলে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তুত করে গেছে ঘরখানা কোন্ এক সাহেব মিস্ত্রি—সেই নেপোলিয়নের আমলের অনেক আগে।

এই সাহেবকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—পরচুল পরা, বেণী বাঁধা, কাঁসির মতো মস্ত গোল টুপিটা মাথায়, গায়ে খয়েরী রঙের সাটিনের কোট, পায়ে বার্নিশ জুতো বকলস দেওয়া, শর্ট প্যাণ্ট, হাঁটুর উপর পর্যন্ত মোজায় ঢাকা, গলার একটা সিল্কের রুমাল ফুলের মতো ফাঁপিয়ে বাঁধা। সাহেব এসে উপস্থিত আমাদের কর্তার কাছে পাল্‌কি

চড়ে। কর্তা সটকায় তখন তামাক খাচ্ছেন হাউসে যাবার পূর্বে। সাহেব মস্ত গোল পাথরের টেবিলে মস্ত একখানা বাড়ির নকশা মেলে ধরেছে, আর একটা পালকের কলমের উলটো দিক নকশার উপরে টেনে টেনে কর্তা সাহেবকে বোঝাচ্ছেন, এ-দেশের নাচঘর, বৈঠকখানা, তাওখানা প্রভৃতির সঠিক হিসেব। কর্তা বসে, সাহেব দাঁড়িয়ে। এখন হেলে একটা মস্ত বেআদবি ঠেকত, কিন্তু তখন এইটেই ছিল চাল এবং চল। সাহেব-ইঞ্জিনিয়ার তখন লিখত নিজের নাম ইংরিজিতে কিন্তু নিজের পেশাটা লেখা থাকত সুন্দর বাংলায়–যেমন 'Mr. George Edwards Eves' উপরে, নীচে লেখা 'গৃহনির্ম্মাণকর্তা।'

কর্তা ছিলেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সওদাগর এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে মানমর্যাদার ইয়ত্তা ছিল না কর্তার। সুতরাং তাঁর খাশ মজলিসের স্থানটা কেমনতরো হওয়া উচিত তা যেন সাহেব মিস্ত্রি বুঝে নিয়ে করেছিল সূত্রপাত এই তিনতলার ঘরটার। আলো, বাতাস, জাহাজ, ঘর–সমস্তকে একটা চমৎকার মতলবের মধ্যে সে ঘিরে নিয়ে বানিয়ে গেছে।

এই হল্–ঐশ্বর্যের গৌরবের জোয়ারের চিহ্ন ধরে ধরে একতলা থেকে যখন উঠল ক্রমে আশি ফুট উপরে তখন পৃথিবীতে আমি নেই, কিন্তু শোনা-কথার মধ্যে দিয়ে তখনকার ব্যাপার যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।–কর্তার খাশ মজলিশ বসেছে রাতের বেলা আমার থেকে চারপুরুষ পূর্বে এই হল্‌টাতে–দক্ষিণের চল্লিশফুট ফালিঘরে পড়েছে সাহেবসুবোর জন্যে রাত্রিভোজের টেবিল অনেকগুলো। টেবিলের উপরে চীনের বাসন থরেথরে সাজানো। সব বাসনেই সোনার জল করা রঙিন ফুলের নকশা। প্রত্যেক বাসনে কর্তার নামের তিনটে অক্ষরের সোনালি ছাপ মারা। ঝকঝক করছে রুপোর সামাদানে মোমবাতি। খানসামা সবাই জরি দেওয়া লাল বানাতের–উর্দি-পরা, কোমরে একখানা করে রুমাল।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরের দিকে একটা বারান্দা–সেখানে আহারের পর আরামে বসে তামাক খাবার ব্যবস্থা রয়েছে–সেখানটাতে হুঁকোবরদার বড়ো বড়ো সোনারূপোর সটকাতে তামাক সেজে প্রস্তুত, বড়ো সিঁড়ির উপরে চোবদার খাড়া, আসাসোটা হাতে স্থির যেন পুতুল! মানুষপ্রমাণ উঁচুতে থাম আর রেলিঙঘেরা বড়ো হল্–লোকলস্কর থেকে পৃথক্-করা উঁচু জায়গাটা ঝাড়ে, লণ্ঠনে, বাতির আলোয় জম্‌জমাট। ঘরজোড়া প্রকাণ্ড একখানা গালিচা–ঘন লাল আর শাদা ফুলের কারিগরি তাতে; ঘরের পুব-পশ্চিম দুটো বড়ো দেওয়ালে দু'খানা বড়ো বড়ো অয়েল পেনটিং–সাহেব ওস্তাদের আঁকা–বরবেশে এই বংশেরই এক ছেলে আর পেশওয়াজ পরা একটি মেয়ে, দু'জনেই হীরে মানিক আর কিংখাবে মোড়া। এই এখন যেমন খোট্টাদের বরসাজ তেমনি ধরনের সাজসজ্জা দু'জনেরই।

গালিচার উপরে মেহগনি কাঠের বাঘ-থাবা, বাঘমুখো অদ্ভুত গঠনের কৌচ কেদারা তেপায়া, একটার মতো অন্যটা নয়। আরামে বসার জন্যেই তৈরি এইসব কৌচ কেদারায় সেই সেকালের লাট-বেলাট-সাহেব-সওদাগর ও চৌরঙ্গীর বাসিন্দা–তারা বড়ো বড়ো সটকায় তামাক টানছে, আর তরফায় নাচ দেখছে গম্ভীর হয়ে বসে। সব সাহেবই পাউডার মাখানো পরচুলধারী। হাতে রুমাল আর নস্যদানী! দু'সারি উর্দিপরা ছোকরা ক্রমান্বয়ে বড়ো

বড়ো পাখার বাতাস দিচ্ছে তাদের, আর মজলিসে রুপোর সালবোটে সোনারুপোর তবক-মোড়া পান বিলি করে চলেছে। আতরদানি গোলাপ-পাশ ফিরিয়ে চলেছে হরকরা তারা।

পাশের একটা খাশকামরা—উত্তর দক্ষিণ ও পুব তিনদিকে খোলা—সেখানে কর্তার সঙ্গে মুরুব্বি সাহেব দু-চারজন বসে। সারি সারি খোলা জানলায় দেখা যায় রাতের আকাশ—যেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দা অনেকগুলো। পুবের ক'টা জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় খালপারের নারকেল গাছের সারি, তার উপরে চাঁদ উঠছে—যেন কানা-ভাঙা সোনার একটা আবখোরার টুকরো। পশ্চিমের খোলা জানালায় দেখা যাচ্ছে সেকালের সওদাগরি জাহাজের মাস্তুলগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় করে দাঁড়িয়ে। উত্তরে—সেকালের শহর ও বাড়ির অরণ্য একটা।

যে-তিনতলার উপর উত্তর-পশ্চিম থেকে বয় গঙ্গার হাওয়া, পুব দিয়ে আসে বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস, উত্তর জানলায় শীতের খবর আসে, দক্ষিণ বাতায়নে রহে-রহে বয় সমুদ্রের হাওয়া, সেখানটাতে একটা রাত নয়—আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলো রাতের মজলিসের আলো, সারিসারি খোলা জানলা হয়ে বাইরে রাতের গায়ে ফেলত একটার পর একটা সোনালি আভার সোজা টান। আর সমস্ত তিনতলাটা দেখাত যেন মস্ত একটা নৌকা অনেকগুলো সোনার দাঁড় কালো জলে ফেলে প্রতীক্ষা করছে বন্দর ছেড়ে বার হবার হুকুম ও ঘণ্টা। এ যারা তখন আশেপাশের বাড়ির ছাতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কর্তার মজলিসের কাণ্ডখানা সত্যি দেখেছে তাদের মুখে শোনা কথা।

BANGLADARSHAN.COM

আমি যখন এসেছি—তখন স্বপ্নের আমল আরব্য উপন্যাসের যুগ বাংলা দেশ থেকেই কেটে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তখন আরম্ভ। 'গুল্‌রকাওলী', 'ইন্দ্রসভা', 'হোমার', এ-সব বইগুলো পর্যন্ত সরে পড়বরা জোগাড় করেছে—এইসময় রামলাল চাকরের সঙ্গে বসে দেখি, দুই দেয়ালে দুই সেই সেকালের ছবির দিকে।—বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে ছবির মানুষ দুটি চেয়ে আছে, মুখে দু'জনেরই কেমন একটা উদাস ভাব ছবির গায়ে আঁকা। হীরে-মুক্তোর জড়োয়া সাজসজ্জা যেন কত কালের কত দূরের বাতির আলোতে একটু একটু ঝিকঝিক করছে। আমি অবাক হয়ে এখনো এই ছবি দেখি আর ভাবি কী সুন্দর দেখতেই ছিল তখনকার ছেলেরা মেয়েরা; কী চমৎকার কত গহনায় সাজতে ভালবাসত তারা।

কল্পনা নিয়ে থাকার সুবিধে ছিল না তখন, কেননা রামলাল এসে গেছে এবং আমাকে পিটিয়ে গড়বার ভার নিয়ে বসেছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেরে-ধরে, এ-বাড়ির আদবকায়দা-দোরস্ত একজন কেউ করে তুলবেই আমাকে, এই ছিল রামলালের পণ! ছোটোকর্তা ছিলেন রামলালের সামনে মস্ত আদর্শ, কাজেই এ কালের মতো না করে, অনেকটা সেকেল ছাঁচে ফেললে সে আমাকে—দ্বিতীয় এক ছোটোকর্তা করে তোলার মতলবে।

ছোটোকর্তা ছুরি-কাঁটাতে খেতেন, কাজেই আমাকেও রামলাল মাছের কাঁটাতে ভাতের মণ্ড গেঁথে খাইয়ে সাহেবী দস্তুরে পাকা করতে চলল; জাহাজে করে বিলেত যাওয়া দরকার হতেও পারে, সেজন্য সাধ্যমতো রামলাল ইংরিজির তালিম দিতে লাগল—ইয়েস নো বেরিওয়েল, টেক্ না টেক্ ইত্যাদি নানা মজার কথা।

কোথা থেকে নিজেই সে একখানা বাঁশ ছুলে কাগজে কাপড়ে মস্ত একটা জাহাজ বানিয়ে দিলে আমাকে—সেটা হাওয়া পেলে পাল ভরে আপনি দৌড়োয় মাটির উপর দিয়ে। এই জাহাজ দিয়ে, আর হাঁসের ডিমের কালিয়া দিয়ে ভুলিয়ে, খানিক বিলিতি শিক্ষা, সওদাগরী-ব্যবসা, কারিগরি, রান্না জাহাজ-গড়া, নৌকার ছইবাঁধা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে পাকা করে তুলতে থাকল আমাকে রামলাল।

তিন তলার ঘরটায়—সেখানে বড়ো কেউ একটা আসত না কাছে, থাকত রামলাল তার শিক্ষাতন্ত্র নিয়ে, আর আমি তারই কাছে কখনো বসে, কখনো শুয়ে, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। সেকালের ঝাড় ঝোলানোর মস্ত হুকগুলো সারিসারি হেঁটমুণ্ড কিম্বাচক চিহ্ন—চেয়ে দেখত রামলালকে আমাকে মেঝের উপর সেই ঘরে। সেখান থেকে ঝাড় লণ্ঠন কার্পেট কেদারার আবরু অনেক কাল হল সরে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

॥মনের কথা॥

যে-খাতার সঙ্গে ভাব হল না, তার পাতায় ভালো লেখাও চলল না। এই খাতাটা অনেকদিন কাছে-কাছে রয়েছে, ভাব হয়ে গেল এটার সঙ্গে। ভাব হল যে-মানুষের সঙ্গে কেবল তাকেই বলা চলল নিজের কথা সুখ-দুঃখের। আমার ভাব ছোটোদের সঙ্গে—তাদেরই দিলেম এই লেখা খাতা। আর যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবন-ভরা সুখ-দুঃখের কাহিনী, এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেরাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায় তাদের আমি দূর থেকে নমস্কার দিচ্ছি। যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে 'গল্প বলো', সেই শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা। শিশু-সাহিত্য-সম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্যে রইল বাঁ হাতে সেলাম; আর ডান হাতের কুর্নিশ রইল তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়া মাদুর নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বকশিশ দিয়ে চলে একটু হাসি কিম্বা একটু কান্না; মান-পত্রও নয়, সোনার পদকও নয়; হয় একটু দীর্ঘশ্বাস, নয় একটুখানি ঘুম-ঢোলা চোখের চাহনি! ওই তারা—যারা আমার মনের সিংহাসন আলো করে এসে বসে, তাদেরই আদাব দিয়ে বলি, গরীব পরবর সেলামৎ—অব্ আগাজ্ কিস্‌সেকা করতা হুঁ, জেরা কান দিয়ে কর শুনো!

BANGLADARSHAN.COM

ছাপা হবে হয়ত বইখানা। একদিন কোনো বেরসিক অল্প দামে কিনে নেমে আমার সারা-জীবন খুঁজে খুঁজে পাওয়া যা কিছু সংগ্রহ। এইটে মনে পড়ে যখন, তখন হাসি পায়। বলি, এ কি হয় কখনো? সব কথা কি কেউ জানতে পারে, না জানাতেই পারে কোনো কালে? অনেক কথা রয়ে যাবে, অনেক রইবে না, এই হবে, তার বেশি নয়।

একটা শোনা-কথা বলি। তখন বাড়িতে প্ল্যানচিট্ চালিয়ে ভূত নামানো চলছে। দাদামশায়ের পার্ষদ দীননাথ ঘোষাল প্ল্যানচিটে এসে হাজির। বড়ো জ্যাঠামশায় তাঁকে জেরা শুরু করলেন—পরকালটা এবং পরকালটার বৃত্তান্ত শুনে নিতে চেয়ে। প্ল্যানচিটে উত্তর বার হল—'যে-কথা আমি মরে জেনেছি, সে-কথা বেঁচে থেকে ফাঁকি দিয়ে জেনে নেবে এ হতেই পারে না।'

আমিও ওই কথা বলি। অনেক ভুগে পাওয়া এ-সব কাহিনী, কিনতে গেলে ঠকতে হয়, বেচতে গেলে ঠকতে হয়। বলে যাওয়া চলে কেবল তাদেরই কাছে নির্ভয়ে, মনের কথা বেচা-কেনার ধার ধারে না যারা, যাত্রা করে বেরিয়েছে যারা, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ কাঠের ঘোড়ায় চড়ে, নানা ভাবে নানা দিকে আলিবাবার গুহার সন্ধানে। ছোটো ছোটো হাতে ঠেলা দিয়ে যারা কপাট আগলে বসে আছে, যে-দৈত্য সেটাকে জাগিয়ে বলে, 'ওপুন চিসম্'—অর্থাৎ চশমা খোলো, গল্প বলো। যারা থেকে থেকে ছুটে এসে বলে—'এই নুড়ি ছোঁয়াব, দেখবে দাদামশায়, লোহার গায়ে ধরে যাবে সোনা!' কুড়িয়ে পাওয়া পুরোনো পিদুম ঘষে ঘষে খইয়ে ফেলে, অথচ ছাড়ে না কিছুতে সাত-রাজার-ধন মানিকের আশা।

॥আবহাওয়া॥

সেকালের আবহাওয়া একালে বদলে গেছে; এখনকার মানুষই যেন অন্য রকম হয়ে জন্মাচ্ছে। সে মজলিস নেই, মজলিসী লোকও নেই। কিন্তু সেকালে আমাদের কী ছিল? এই বাড়িতেই দেখেছি, যখন যেখানে যেমনটি প্রয়োজন ঠিক তেমনটি পাওয়া যেত; সব যেন আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবের সংকীর্ণতায় প্রাণবস্তুর কাটছাঁট তখনো শুরু হয় নি। নানা প্রয়োজন এবং বাহুল্যের সরবরাহ করে মজলিসকে বাঁচিয়ে রাখা যাদের কাজ ছিল, সেই চাকর-বাকররাও ছিল তেমনই, মজলিসের রস তাদেরও ছুঁয়ে যেত। আজকাল মজলিস নাম দেয় বটে, কিন্তু তাতে মজলিসত্ব কিছু নেই, তফাত বুঝতে পারি না—আনন্দসভায় আর শোকসভায়; সেই সভাপতি, সেই উদ্‌বোধন সংগীত, সেই বক্তৃতা, সেই সমাপ্তি সংগীত। সবই আছে, মজলিসের প্রাণটুকুই শুধু নেই।

সেকালের বৈঠকেরও এই দুর্গতি হয়েছে। সে আমলে এই মজলিস আর বৈঠক ছিল সত্যি, জীবন্ত, আমরাও তার শেষ রেশটুকু দেখেছি। ও-বাড়িতে বসত বড়ো জ্যাঠামশাইদের বৈঠক সকালে; বাবামশাই, বড়োজ্যাঠামশাই সবাই বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। বড়ো জ্যাঠামশাই 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখেছেন, তাই নিয়ে অবিরত চলছে সাহিত্য আলোচনা; দার্শনিকেরা আসতেন, পণ্ডিতেরা আসতেন, নিজের নিজের সটকা নিয়ে আসর জমিয়ে সবাই বসতেন; অবাধে বসত সাহিত্যের হাওয়া। ছেলেবেলায় উঁকিঝুঁকি মেরে আমিও দেখেছি এই বৈঠকের চেহারা।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধেয় বসত জ্যোতিকাকামশাইদের বৈঠক। এ বৈঠকের চেহারা ছিল আর-এক রকম; সেখানে আসতেন তারক পালিত, ছোটো অক্ষয়বাবু, কবি বিহারীলাল। রবিকা বয়সে ছোটো হলেও এই বৈঠকেই যোগ দিতেন। এখানে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন কাকীমা অর্থাৎ জ্যোতিকার স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্ত্রী। এখানে চলত গান, বাজনা, কবিতার পর কবিতা পাঠ।

এ-বাড়িতে বাবামশাইয়ের ছিল আলাদা বৈঠক, এখানে পাড়া-পড়শীরা এসে বসত, তামাক, গান-বাজনা, খোশগল্প চলত; অক্ষয় মজুমদার টপ্পা গাইতেন; অম্বুরী তামাকের গন্ধে আসর মাত হয়ে থাকত। সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

সে-যুগের তিন রকম মজলিসের ছবি দিলুম। এই আবহাওয়ার মধ্যে রবিকা বড়ো হয়েছেন। তখন সব দিকে সামঞ্জস্য বজায় ছিল, শিল্প সাহিত্য গানের অফুরন্ত বিকাশের মধ্যে তিনি মানুষ। সে যুগে এমন বিদ্বজ্জন সমাগম আর কোথাও হত না। বঙ্কিমবাবু আসতেন। মনে আছে, একবার রবিকার 'কাল-মৃগয়া' নাটকটি আগাগোড়া গান গেয়ে তাঁকে শোনানো হয়েছিল। আবছা মনে পড়ছে আমাদের উপর ভার ছিল ফুলদানি সাজাবার। সহবৎদুরন্ত ভালো কাপড় জামা পরে হাজির হবার হুকুম হল আমাদের উপর। একালের মতো এলোমেলো অগোছালো ভাবে ছেলেরা যেখানে সেখানে যেতে পারত না। এই জীবনযাত্রার মধ্যে যিনি মানুষ তিনি যে সকলবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা দেখাবেন, সে আর বিচিত্র কী। আমাদের এই বাড়ির

জীবনযাত্রা পুরাতন চালে অনেক দিন হয়েছিল। আমাদের আমলেও এর জের ছিল কিছু। তারপর আস্তে আস্তে আজকালকার ক্লাবের সৃষ্টি হল, পুরাতন চাল বিদায় নিলে।

যেমন বাইরে, অন্দরমহলেও তেমনই দেখেছি গুরুজনের সম্পর্কে সমীহ করে চলার রেওয়াজ; খাওয়া-দাওয়া তাঁদেরও একটু বেচাল হওয়ার জো ছিল না।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে, অরুদা একবার চা-বাগান থেকে ফিরে এলেন, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব—কোট-প্যাণ্ট হ্যাট টাই, কুলী খাটিয়ে মেজাজও হয়েছে সাহেবী। ইংরেজি ফ্যাশন-দুরন্ত সাজ পরে তিনি একদিন বাইরে বেরুচ্ছেন, দেউড়ির বাইরে এসেছেন, উপরের বারান্দা থেকে বড়ো জ্যাঠামশাইয়ের নজরে পড়ে গেলেন। অমনই শুরু হল হাঁকডাক। জ্যাঠামশাই উপর থেকেই বললেন, অরু, এই অভব্য বেশে তুমি চলেছ রাস্তায়? একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। চাকর ছুটল, দরোয়ান ছুটল, অরুদার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। সাজ-পোশাকের দস্তুর তখন মেনে চলতেই হত—এক ছাঁটে বেরুনো বারণ ছিল। বে-আইনী পোশাকে ছোটো ছেলেদেরও কাউকে যদি সদরে দেখা যেত, অমনই তলব পড়ত চাকরদের, কঠিন শাস্তি পেতে হত তাদের। আজ আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি লুঙি পরে বসে আছি, আমাদের ছেলেরা হ্যাটকোট পরছে।

যা বলছিলুম। ইদানীং দেখছি, সব তফাত হয়ে গেছে। ছোটোখাটো স্মৃতি-সভা, টাউন হলের সভা, গান-বাজনার আসর সবই যেন এক রকম। বিয়ের বাসর আর মৃত্যু-বাসর সবই এক। এগুলো আমাদের বড়ো চোখে লাগে। রবিকাকে একবার বলেছিলুম, রবিকা, একটা ব্যবস্থা করো দেখি, এ রকম তো আর দেখতে পারি নে। সব অনুষ্ঠানগুলো তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেল। তিনি জবাব দিলেন না, চোখ বুজে রইলেন। রবিকা এই যে ঋতুতে ঋতুতে উৎসব করতেন, তাঁর মনের মধ্যে ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঠিক রূপটি ধরা পড়ত। শান্তিনিকেতনে যে-সব অনুষ্ঠান হত, তার সমস্ত আয়োজন তাঁর ব্যবস্থামত হত। কার পর কী হবে, কোথায় কী থাকবে, কে কোথায় বসবে, আগে থাকতে সব ছঁকে দিতেন। একবার কলকাতাতে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির শিল্পীরা ওঁকে সংবর্ধনা করেছিল। উৎসবের একটা ভালো রকম ব্যবস্থার জন্যে আমি ওঁকেই গিয়ে ধরলুম। সমস্ত অনুষ্ঠানের এমন-একটা রূপ দিয়ে দিলেন যে, বিস্মিত হতে হল। এই আমাকেই চেলীর জোড় পরিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাছাই করা বৈদিকমন্ত্র পড়িয়ে তবে ছাড়লেন। আমি নিজে শিল্পী হয়ে তাঁর শিল্প ও সুষমা-বোধের পরিচয় পেয়ে অবাক না হয়ে পারলুম না। এখন বুঝতে পারি, এই-সব অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক করবার জন্যে কর্তার যে শক্তি দরকার, তা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তিও বিদায় নিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে অনুষ্ঠান জিনিসটাও বিদায় নেবে।

রবিকা কোনো জিনিস এলোমেলো আগোছালো ভাবে হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না—এই শিক্ষা তিনি পুরানো যুগের আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো অনুষ্ঠানে পান থেকে চুন খসবার জো ছিল না। সব ঠিক ঠিক হতেই হত।

BANGLADARSHAN.COM

রবিকার সঙ্গে সঙ্গে এই-সব অনুষ্ঠান, পুরানো যুগের সব স্মৃতি বিদায় নিলে। রবিকা বলতেন, ‘দেখ, আমরা চলতে বলতে একভাবে শিখেছিলুম, তাই এ যুগের লোকের সঙ্গে আর তাল মেলাতে পারি নে।’ তিনি মুখে এ কথা বললেও নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল এবং তাঁর জীবনে তাল না মেলবার দুঃখ তাঁকে পেতে হয় নি। পুরানো আনুষ্ঠানিক আবহাওয়া তিনি যথাযথ বজায় রেখেছিলেন তাঁর সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। নিজের জোরে নতুনের সঙ্গে পুরাতনকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

॥রবিকাকার পুষ্যিপুত্তুর॥

সে যা এক মজার গল্প, রবিকাকার এক পুষ্যিপুত্তুর জুটেছিল জানো সে কথা? তখন রবিকাকার সবে বিয়ে হয়েছে, দোতলার ঘরে থাকেন। ঘরের আর একটা ছোটোঘর বানিয়ে নিলেন। তাতে ছোটো ছোটো তক্তা দিয়ে সাজিয়ে বেশ বসবার ঘর বানিয়েছেন। সেখানেই তাঁর যাবতীয় বই থাকে, লেখবার নিচু ডেস্ক, তাতেই মাটিতে বসে লেখাপড়া করতেন। এমন সময়ে একদিন একটা ছোকরা ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড় উস্কোখুস্কো চুলে কাকীমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, স্বপ্নে নাকি দেখেছে কাকীমা ওর পূর্বজন্মের মা ছিলেন, আদেশ হয়েছে রোজ চরণামৃত খেতে হবে কিছুকাল ধরে, গড় হয়ে এক প্রণাম। সে আর নড়ে না, কোথাও যাবে না। কাকীমার মায়া লাগল, মা বলে ডেকেছে, বললেন, আচ্ছা বাবা থাকো এখানেই। রবিকাকা আর কী করেন, রাজী হলেন। লোকটা রোজ কাকীমাকে পেন্নাম করে পাদোদক খায়। বেড়ে আছে, রবিকাকা আর কাকীমা ওকে কাপড়-চোপড় কিনে দেন, এটা ওটা দেন। দিব্যি ঘরের ছেলের মতো থাকে। এখন তাঁর সাজসজ্জাও কী পরিপাটি, উস্কোখুস্কো চুলে তেলজল পড়ল, তাতে সিঁথি কেটে কোঁচানো ধুতি চাদর পরে ক্রমে ক্রমে সে কাকীমার ছেলে হয়ে উঠল। আগে থাকত নীচে দপ্তরখানায়, এখন দোতলায় উঠে গেল। পাদোদক পান করে একেবারে পদবৃদ্ধি হয়ে গেল। বাড়ির সবাই রবিকাকার পুষ্যিপুত্তুরের উপর মহা বিরক্ত। অথচ কেউ কিছু বলতে পারে না। সত্যদাদা ছিলেন রবিকাকার ভাগ্নে, সম্পর্কে ভাগ্নে হলেও বয়সে বড়ো ছিলেন। তিনি না পেরে মাঝে মাঝে বলতেন, রবিমামা এ তুমি করছ কী। ও লোকটার হাবভাব সুবিধের নয়। রবিকাকা তাঁকেও তাড়া লাগাতেন, বলতেন, যাও যাও, তোমাদের যত সব বাজে ভাবনা, বেচারা গরীবের ছেলে, বাড়িতে আছে তাকে নিয়ে তোমরা কেন লাগাতে যাও। কারো কথায়ই কান দেন না। সত্যদাদা ছাড়তেন না, মাঝে মাঝে বলতেন আর রবিকাকাও তাড়া লাগাতেন। রবিকাকার তখন সংস্থান বেশি ছিল না। কর্তাদাদামশায় কিছু দিতেন আর বই থেকে কিছু অল্পসল্প আয় হত, সে আর কতই-বা তাই থেকে লোকটার সব খরচ জোগাতেন। দেখতে দেখতে তাঁর পুষ্যিপুত্তুর ফিটবাবু হয়ে উঠল, বার্নিশ করা জুতো হল, তার সাজের বাহার কত। এই হতে হতে ক্রমে রবিকাকার বই চুরি যেতে লাগল দুটি-একটি করে। রবিকাকা একে ধমকান তাকে ধমকান, চাকর-বাকরদের তম্বি করেন কিন্তু ওই লোকটাকে কিছু আর বলেন না। বই চুরি চলতেই লাগল। রবিকাকার জামাকাপড় এদিক ওদিক হলে বুঝতেন যে ওই লোকটাই নিয়েছে, কিছু বলতেন না। কিন্তু যখন তাঁর বই ধরে টান পড়ল তখনই হল মুশকিল। তবু আশ্চর্য তখনো ওই লোকটাকে সন্দেহ করতেন না। সত্যদাদা বলতেন, রবিমামা, এ কাজ তোমার ওই পুষ্যিপুত্তুরেরই। রবিকাকা চুপ করে থাকেন। একদিন আরো একটা কী দামী বই চুরি গেছে, রবিকাকা লোকটাকে ডেকে বলতে সে বললে, আমি সত্যবাবুকে এই ঘরে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। আমি বাইরে বেরিয়েছিলুম, বাড়ি ফিরে দেখি সত্যবাবু আপনার ঘরে ঘুর ঘুর করছেন। এই যা বলা রবিকাকা তো বুঝলেন সব ব্যাপার, তা হলে এই লোকটারই কাজ। যখন এত সাহস যে সাফ সত্যবাবুর নাম বলে দিলে। এই তখন সত্যদাদা বিগড়ে গেলেন, বললেন, কী আস্পর্ধা, দাঁড়াও, তক্‌কে তক্‌কে থাকব। আমার নামে লাগিয়েছে

BANGLADARSHAN.COM

বাবা দেখে নেব। এইবারে বাড়িসুদ্ধ সবাই ওর উপরে খাপ্পা। চাকর-বাকরদের উপর কড়া হুকুম হল যেন লোকটাকে চোখে চোখে রাখে। রবিকাকার ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না আর। লোকটাও তখন বুঝেছে যে আর বেশি দিন চলবে না এখানে, তার প্রতাপ কমেছে। শেষে একদিন রবিকাকা কোথায় বেরিয়ে গেছেন। কর্তাদাদামশায় একবার রবিকাকাকে একটা ক্যারেজ ক্লক বকশিশ দিয়েছিলেন, বেশ বড়ো ঘড়ি আর খুব দামী, সেটা রবিকাকার ওই লিখবার ঘরেই থাকত। লোকটা করলে কী কেমন করে এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে সেই ক্যারেজ ক্লক, কলম, খাতা, দামী দামী বই—সেগুলি কুক কোম্পানিতে বিক্রি করত—আরো সব কী কী আলনা থেকে গোপনে ধুতি চাদর সব নিয়ে সেজেগুজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা কী সে-সব কিছু জানি। আমরা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল। আমরা আরো বলাবলি করতে লাগলুম যে পুষ্যিপুত্তুর চলেছেন দেখ সেজেগুজে। সে সেই যে বেরিয়ে গেল তো গেলই। রবিকাকা ফিরে এলেন, ঘরে ঢুকে দেখেন ঘর খালি। তখন চৈতন্য হল। সত্যদাদা ওঁরা বললেন পুলিসে খবর দাও, কিন্তু আশ্চর্য রবিকাকা, বললেন কী আর হবে, যাক গেছে তো গেছে। রবিকাকার পুষ্যিপুত্তুর অদৃশ্য হল, আর খোঁজ নেই। রীতিমত রবিকাকাকে বসান দিয়ে ছাড়লে কিন্তু পুষ্যিপুত্তুরের ভাগ্য তাঁর এখনো। অনেক পুষ্যিপুত্তুর ঢুকছে ক্রমে ক্রমে, তারাও অদৃশ্য হবে। রবিকাকার ওই এক মজা দেখেছি কেউ একবার কোনো রকম করে ঢুকতে পারলে হয়, বেশ-কিছু করে নিয়ে সরে পড়তে পারে। আর কাউকে অবিশ্বাস নেই। প্রবোধ ঘোষ রবিকাকার ক্লাসফ্রেণ্ড, ছেলেবেলার বন্ধু, তিনিই প্রথম রবিকাকার ‘কবি-কাহিনী’ ছাপিয়ে ছিলেন। তিনি একবার কোনো-এক বিশেষ ব্যক্তির নামে কী বলেছিলেন যে ও লোকটি স্পাই। তাঁকে রবিকাকা এ্যায়সা তাড়া মারলেন, বললেন, তোমাদের কেবল সন্দেহ কেবল অবিশ্বাস লোকের উপর। বুঝে দেখো, ছেলেবেলার বন্ধু ভালো বুঝে কথাটা বলতে এসে তাড়া খেয়ে ফিরে যান। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ রবিকাকা, এমন সরল বিশ্বাস সবার উপরে। কাউকে কোনো দিন সন্দেহের চোখে দেখতে দেখি নি।

BANGLADARSHAN.COM

॥শিশুদের রবীন্দ্রনাথ॥

আমরা সবাই তখন খুব ছোটো। তখন সব ছেলে মিলে মাথা খাটিয়ে একটা ইস্কুল ইস্কুল খেলা বার করা গেল। তাতে আমরা সকলে ভর্তি হলুম।

সেই ইস্কুল বসত, দেউড়ি থেকে দরোয়ানদের বেঞ্চিগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ির পুবের রাস্তাতে। সে ইস্কুল-খেলায় দীপুদা মাঝে মাঝে মাস্টার হয়ে এসে বসতেন।

নীচে খেলা হয়। রবিকাকা থাকেন তাঁর বাড়ির উপরের বারান্দায়। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে খেলা দেখেন।

মাঝে মাঝে মাস্টারের কাছে ছুটি নিয়ে জল খাওয়া হত। খেলা ভাঙলেই ফিরিওয়ালার কাছ থেকে ছোলা-ভাজা কিনে খাওয়ার ধুম পড়ে যেত। এইরকম রোজই চলে।

তারপর পরীক্ষার সময় এসে পড়ল। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হলে প্রাইজ দেবে কে? ভেবেচিন্তে রবিকাকাকে নিমন্ত্রণ করা হল, প্রাইজ দেবার জন্যে। সেই প্রথম আমাদের রবিকাকার সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে যোগ।

তারপর বড়ো হলুম। তখন আর রবিকাকার সঙ্গে ছোটো-বড়ো ভাব নেই। উনি লেখক, আমি আর্টিস্ট, এস্‌রাজ বাজাই। সেই সময় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এসে জুটলেন, তিনি মেতে থাকেন হাফটোন ব্লক নিয়ে। ছবি ছাপা নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ হত।

BANGLADARSHAN.COM

কথা উঠল, শিশুদের জন্য কিছু করা যাক। রবিকাকার মাথায় প্রথম এল, একটা সিরিজ বার করা যাক। নাম দেওয়া হল বাল্য গ্রন্থাবলী সিরিজ। তখন শিশুদের পড়বার মতো বই ছিল না। তিনি বললেন, ‘তুমি গল্প লেখো।’

আমি ভয় পেলুম। কারণ ও-সব আমার আসে না। সে কথা অন্য লেখায় আগেই বলেছি। কিন্তু আপত্তি টিকল না। আমার ওপরে ভার পড়ল শকুন্তলা লেখবার। আমি লিখলুম ‘শকুন্তলা’, ‘ক্ষীরের পুতুল’ আর রবিকাকা লিখলেন একখানি ছোটো কবিতার বই ‘নদী’—ওখানা যে ছোটোদের জন্যে, ওতে লেখা নেই বটে, কিন্তু ওটা বালকদের জন্যেই লেখা।

ছেলেদের জন্যেই ওঁর ভাবনা বরাবরই ছিল—তাঁর বাল্যকাল থেকেই। আমাদের ইস্কুল-খেলাতেও বালকবালিকাদের কথা ভেবে লেক্‌চার দিয়েছিলেন। আজও শান্তিনিকেতনে বসে সে ভাবনা ছাড়তে পারেন নি। তিনি কাকীমাকে (রথীর মা) দিয়েও অনেক রূপকথা সংগ্রহ করিয়েছিলেন। কাকীমা সেই রূপকথাগুলি একখানি খাতায় লিখে রাখতেন, তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতাখানি থেকেই আমার ‘ক্ষীরের পুতুল’ গল্পটি নেওয়া।

এইখানেই রবিকাকার বিশেষত্ব। ছেলেদের নিয়েই তিনি আছেন, শিশুদের ওপরে তাঁর অগাধ টান। এমন-কি, যারা কিছু বোঝে না, সেই খুব-কচি শিশুদেরও জন্যে কী লেখা যেতে পারে, তাও তিনি ভাবেন। এ দেশের আগেকার আর কোনো কবির সম্বন্ধে একথা বোধহয় বলা যায় না। কিন্তু কবিদের জীবন এইরকম হওয়া উচিত– রামধনুর সাতটি রঙের ভিতর দিয়ে তার গতি। সব বয়সের মানুষ নিয়েই কবিদের থাকতে হবে। সকলের সহিত যে চলতে পারে তাই হচ্ছে সাহিত্য, আমার এই মত। আর্টিস্টদের সম্বন্ধেও ওই কথা। আমি তাই নন্দলালকে মাঝে মাঝে বলি, 'ছেলেদের জন্যে তুমি কী করলে? ছেলেদের ছেড়ে কবি হওয়া যায় না। এখনো এ দেশে ছেলেমেয়েদের মনোমতো নাটক কি অপেরা কেউ লিখলে না। এক রবিকাকার 'ডাকঘর', 'বাল্মীকিপ্রতিভা', আর 'হেয়ালি-নাট্য', 'তাসের দেশ' ইত্যাদি ছাড়া আর কই কে লিখেছে বলো?

BANGLADARSHAN.COM

॥শকুন্তলা॥

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারিসারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত আর ছিল–ছোটো নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির–আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া–সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকলপরা কতগুলি ঋষিকুমার।

BANGLADARSHAN.COM

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কী করত?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল–খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল–মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ কথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল–আঁধার ঘরের মাণিক–ছোটো মেয়ে–শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি–দুধের বাছা–শকুন্তলা-মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সে মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরতকী বনে হরিতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে

করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর—সে-ও তার আপনার, এমন-কি—বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়োই আপনার দুই প্রিয়সখী অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণশিশু—বড়োই ছোটো—বড়োই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, সকালে-সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ-ছাড়া আর কী কাজ ছিল?—হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুন্-গুন্ গল্প করা, নয় তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

BANGLADARSHAN.COM

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনুসূয়া প্রিয়ম্বদা আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।

॥তপোবনে॥

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—'সুন্দরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল?

কতদিন গেল, কত রাত গেল; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল? হায় হায়, সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না।

পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটিরে-দুয়ারে—দুজনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই। রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির-দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

BANGLADARSHAN.COM

রাজার রথ কেন এল না?

কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায়-কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপরে শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি—যার জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল যে দেখবে কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষে এই শাপান্ত হল–'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না-পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।'

দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন!

বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনি শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না।

প্রিয়ম্বদা কেশর-ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধ-ফুলের তেল নিয়ে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে; কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আল্‌তা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না! সখীর এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানী, তার কি এই সাজ?–হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল?–হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়?

BANGLADARSHAN.COM

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়?

শকুন্তলা কোনদিকে যাবে–সোনার পুরীতে রানীর মতো রাজার কাছে চলে যাবে?–না, তিন সখীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি-কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া এত ভালোবাসা কাটানো কি সহজ?

মা-হারা হরিণশিশুকে তাত কণ্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয় সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাত কণ্ব ফিরলেন।

দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে– ‘দেখিস, ভাই, যত্ন করে রাখিস।’

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত কণ্বকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল–বনখানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার-জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক কোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা, বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল, আংটির কথা মনেই পড়ল না।

BANGLADARSHAN.COM

॥রাজপুরে॥

দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাত মহল বাড়ি, তার এক এক মহলে এক এক রকম কাজ চলছে।

প্রথম মহলে রাজসভা—সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন; সেখানে দোষী-নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর দেবমন্দির—সেখানে সোনার মানিকের পাখি, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা। মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অতিথিশালা—সেখানে সোনার থালায় দুসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে।

তারপর নৃত্যশালা—সেখানে নাচ চলছে, শানের উপর সোনার সূপুর রুনুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে।

সংগীতশালায় গান চলছে, সোনার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা রাজাদুষ্মন্ত বসে আছেন, দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে; শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায়, দুর্বাসার শাপে, সুখের অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন।

BANGLADARSHAN.COM

আর শকুন্তলা কত ঝড়বৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন—'কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কী চাও? টাকা-কড়ি চাও, না, ঘর-বাড়ি চাও? কী চাও?'

শকুন্তলা বললে—'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়িও চাই না, ঘর-বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'

রাজা বললেন—'ছি ছি, কন্যে, এ কী কথা! তুমি হলে বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘর-বাড়ি চাও তাই নাও, গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও—এ কেমন কথা?

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে—'মহারাজ, সে কী কথা! আমি যে সেই শকুন্তলা—আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই, মহারাজা, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুন্‌গুন্‌ গল্প করছিলুম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা-ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলাম, তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে কিছুতে এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল, আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে—দুইজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব!—শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর, মহারাজা, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো সে বনে

রইলে। বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে কতদিন কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জ বনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে—মহারাজ, সে-কথা কি ভুলে গেলে?

যাবার সময় তুমি মহারাজ, আমার হাতে আংটি পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে—নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনি করে কি কথা রাখলে?'

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণশিশুর কথা—কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন—'কই, কন্যা, দেখি তোমার সেই আংটি? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটি?'

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য!

রাজার সেই সাতরাজার ধন এক মানিকের-বরণ-আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে দুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না!

BANGLADARSHAN.COM

'মা-গো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল, অমনি সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিন শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোল-ভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল।

শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করল। রূপোলি রঙের সরলপুটি, চাঁদের মতো পায়রা-চাঁদা, সাপের মতো বাণমাছ, দাড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁটা-ভরা বাটা কত কী জালে পড়ল। সোনালি রূপোলি মাছে নদীর পাড় মাছের ঝুড়ি যেন সোনায় রূপোয় ভরে গেল। সারাদিন জেলেদের জালে কত রকমের যে মাছ পড়ল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল; জাল গুটিয়ে জেলেরা ঘরে চলল।

এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে ঘুরে, নদীর এ-পার ও-পার জুড়ে জলে পড়ল। সেই সময় মাছের সর্দার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলে পাড়ায় রব উঠল—জাল কাটবার গুরু, মাছের সর্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড়ো মাছ কেউ কখনো দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাতরাজার ধন এক মানিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিক্‌রে পড়ল তখন সবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের সীমা রইল না।

গরীব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আংটি সেকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়েছিলেন—এ সেই আংটি। শচীতীর্থে গা-ধোবার সময় তার আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল।

জেলের হাতে রাজার মোহর আংটি দেখে সেকরা কোটালকে খবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে-মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে।

BANGLADARSHAN.COM

রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যিই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই, কেবল—'হা শকুন্তলা!—হা শকুন্তলা!'

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ নেই; রাজকার্যে সুখ নেই, অন্তঃপুরের সুখ নেই, উপবনে সুখ নেই—কোথাও সুখ নেই।

সংগীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হল, উপবনে উৎসব বন্ধ হল।

রাজার দুঃখের সীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকূটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা, রাজা-দুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূসর পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার কৃপা হল।

স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে, রাজা রাজ্যে ফিরছেন– এমন সময় দেখলেন, পথ হেমকূট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চললেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত– শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনি বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়োই ভালোবাসত।

সেই বনে সাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত।

হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত–এই তার রাজসিংহাসন। দুদিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল; আর ছিল–শুক-পাখি তার প্রিয়সখা কত মজার মজার কত বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাসায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত–কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাও তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাসত।

BANGLADARSHAN.COM

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজশিশুকে কোলে নিলেন; দুষ্টু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁরই পুত্র। ভাবছেন–পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন।

রাজারানীতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজধানী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কতদিন সুখে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে, রাজারানী সেই তপোবনে তাত কণ্বের কাছে, সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণশিশুর কাছে, সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM